লাইব্রেরি আন্দোলন প্রসঙ্গে

ম. আ. কাশেম মাসুদ

মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, অন্যের মত প্রকাশে প্রবল বাধাসহ ভিন্নমতের প্রতি চূড়ান্ত রকমের অসহনশীলতা এবং নাগরিক অধিকারচর্চার সংকটে আজকের বিশ্ব পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সমস্যা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এসবের অভিঘাতে দেশে দেশে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীনচর্চার সুযোগও সংকুচিত হচ্ছে। প্রতিনিয়তই আমরা দেখছি আমাদের চারদিকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘাত–যা এইসব সংকটেরই প্রতিফলন। আজ প্রত্যেকের জন্য একান্তভাবে প্রত্যাশিত একটি সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যের নাগরিক জীবনযাপনই কঠিন হয়ে পড়েছে। যুগে যুগে এমন সংকট মোকাবেলায় আলোকপ্রাপ্ত সচেতন ও বিবেকবান নাগরিক সমাজই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

উন্নত জাতি, সমৃদ্ধ দেশ সকলেরই কাম্য। সুতরাং সে লক্ষে মানসম্মত সমাজ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আলোকিত সচেতন মানুষ তৈরি করার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের জাতীয় সংগীতের উল্লেখে বলা যায়–প্রকৃত সোনার বাঙলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ তথা সচেতন প্রজ্ঞাবান মানুষ দরকার। মানুষ যদিও প্রকৃতি এবং সমাজ থেকে জ্ঞান অর্জন করে, কিন্তু বই নিঃসন্দেহে আবেগ আশ্রিত জ্ঞানের আধার। জ্ঞানভিত্তিক মানবিক সমাজ ও শোষণ-বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠন এবং জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টিতে আলোকিত সচেতন মানুষই পারে যথাযথ ভূমিকা রাখতে।

তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের অগ্রগামী নাগরিক সমাজ জ্ঞানভিত্তিক মানবিক সমাজ নির্মাণ করে এই সংকট উত্তরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে, স্বাভাবিকভাবে এটাই আজ সময়ের দাবি। এই ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত নাগরিক সমাজ বিনির্মাণে সারা দেশে বিদ্যমান কয়েক সহস্র লাইব্রেরি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। ইউনেস্কোর স্বীকৃতমতে লাইব্রেরি জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। লাইব্রেরি মুনাফাহীন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। বড় কথা, লাইব্রেরি হতে পারে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম।

বর্তমান সময়ে লক্ষ করা যায়, মানুষ তেমন লাইব্রেরিমুখী হচ্ছে না। বই পড়ার অনাগ্রহতার পাশাপাশি ভার্চুয়াল জগতের প্রতি আকর্ষণ সমাজে মূল্যবোধের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার জন্ম দিচ্ছে। এক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধ উন্নয়নে ও ভবিষ্যতের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় লাইব্রেরি-আন্দোলন কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। লেখার মান ও লেখকের কল্যাণের বিষয়টিও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনায় উন্নয়নসহ লাইব্রেরিকে আরও সক্রিয় করার ভাবনা থেকে দেশের সর্বত্র লাইব্রেরি-আন্দোলন গড়ে তোলা প্রাসঙ্গিক। এই আন্দোলন দেশে বিদ্যমান সব পর্যায়ের অন্যান্য লাইব্রেরি-সংগঠনের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখবে।

এসব চিন্তাভাবনা বাস্তবায়নে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা হলো– পরিশীলিত জীবন গঠনে অপরিহার্য এমন একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সারা দেশের লাইব্রেরিকে ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ আধুনিক মডেল-লাইব্রেরি হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করা; এবং বহুমুখী সেবা প্রদানে সক্ষম এমন সমৃদ্ধ লাইব্রেরি-পর্যায়ে উন্নীত করা। সরকারি লাইব্রেরিগুলোর জন্যও সুপারিশ প্রদান করতে হবে। এই লক্ষ্যে লাইব্রেরিসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণে ও আরও সক্রিয় করে তুলতে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ব-স্ব লাইব্রেরি-এলাকায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নিয়মিত আবৃত্তি, বিতর্ক, বক্তৃতা, শিশুদের হাতের লেখা, ছড়া প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন; পাঠক সমাবেশ, বিষয়ভিত্তিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা, গল্প বলার আসর; এলাকার ডাক্তারের পরিচালনায় স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা ও চিকিৎসাসেবা দেওয়া; এলাকার সম্মানিত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন; বইমেলা ও লোকমেলা প্রভৃতির আয়োজন করা। এ-ছাড়া লাইব্রেরিসমূহকে সমৃদ্ধ করা, যাতে এসব লাইব্রেরি ছাত্রছাত্রী ও জনগণকে প্রয়োজনীয় বইয়ের চাহিদা মেটানো ছাড়াও উচ্চগতির ইন্টারনেট-সেবাযুক্ত সার্ভিস প্রদান, ফটোকপি ও স্ক্যানিং করার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে পারে।

লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে লাইব্রেরির বর্তমান অবস্থা, জ্ঞানচর্চা কার্যক্রমের মূল্যায়ন, চাহিদা নিরূপণ, সমস্যা ও সম্ভাবনা জানতে সময়ে সময়ে সারা দেশে জরিপ-কার্যক্রম পরিচালনা করা; 'বেজলাইন সার্ভে'র ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকারি দপ্তর এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা; লাইব্রেরি কার্যক্রমে বা জ্ঞানচর্চায় সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতপূর্বক কর্মসূচি গ্রহণ করাও সঙ্গত হবে। সারা দেশের লাইব্রেরিসমূহের মান উন্নীতকরণ এবং লাইব্রেরি পরিচালনায় যুক্ত ব্যক্তিদের পেশাদারিভিত্তিক জ্ঞানবৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলাভিত্তিক, আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমাবেশ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। লাইব্রেরিতে গণশিক্ষা ও সাপ্তাহিক জ্ঞানআড্ডা পরিচালনার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। লাইব্রেরিকে একটি সংস্কৃতিকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তাছাড়া লাইব্রেরি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জার্নাল, পত্রিকা, বুলেটিন ও বই প্রকাশে ভূমিকা রাখা দরকার। এজন্য যোগ্য সদস্যদের নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা। উক্ত পরিষদ বই ও অন্যান্য বিশেষ প্রকাশনার দায়িত্বপালন ও সম্পাদনা নীতিমালা প্রণয়ন করবে। তাছাড়া লেখক-কল্যাণ এবং গ্রন্থের উন্নয়ন, সৃজনশীল লেখকের বই প্রকাশ ও বিতরণে সহযোগিতা করবে। এজন্য সমবায়-ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। আধুনিক মডেল-লাইব্রেরি গড়ে তুলতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। সংগঠনের নিজস্ব জায়গায় আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরি গড়ে তোলা যায়। সেইসঙ্গে একটি প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি নিয়মিত পরিচালনা করা এবং একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। সংগঠনের

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূরণে যা কিছুই সহায়ক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে সেসব বাস্তবায়নে সংগঠন সর্বদাই সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। স্থানীয় কমিটি হতে মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হবে। স্থানীয় লাইব্রেরিতেই উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক অফিস স্থাপিত হবে এবং কমিটিগুলো স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের জীবনাচরণও জটিল হয়েছে। মানুষ যেমন সেবামূলক কাজে আর সেভাবে সময় দিতে পারে না, তেমনি ফলাফলও দ্রুত আশা করে। প্রাপ্তির হিসেবটাও অনেকের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। আরেকটি বিষয় হলো, প্রত্যেকটি লাইব্রেরির নিজেদের মতো করে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটি রয়েছে। সুতরাং সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন মনে আসতে পারে। তবে এসব বিষয় সহজেই সমাধানযোগ্য এ কারণে যে, সবাই তো জ্ঞানচর্চা ও সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্য নিয়ে সেচ্ছাসেবী হয়েই কাজে নেমেছেন। সুতরাং স্থানীয় উদ্যোগ ও কল্যাণ-কার্যক্রমকে জাতীয়ভাবে বৃহৎ কার্যক্রমে সহযাত্রী করলে সুফল ছাড়া বিতর্কের সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাছাড়া জাতীয় কল্যাণ ও লাইব্রেরিগুলোর স্বার্থগত বিষয়ে বৃহৎ ঐক্য না হলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দাবি আদায় সম্ভব হবে না। তাই লাইব্রেরি কার্যক্রমকে অবশ্যই একটি আন্দোলনে রূপ দিতে হবে।

বাংলাদেশে গণগ্রন্থাগার সংক্রান্ত কিছু তথ্য:

লাইব্রেরি বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইন প্রণীত হয় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। এরপরই বাংলাদেশে প্রথমে রংপুরে এবং ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে যশোরে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় 'যশোর ইনস্টিটিউট অ্যান্ড লাইব্রেরি'। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল, রংপুর ও বগুড়ায় এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমান্বয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমল মিলিয়ে অসংখ্য বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে–যার সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের অধিক। পারিবারিক এবং এনজিও-র উদ্যোগেও অনেক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় সরকারি উদ্যোগও রয়েছে। উল্লেখ্য, লাইব্রেরি মূলত মুনাফাহীন সেবাদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান।

সরকারি উদ্যোগে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে 'সোসাল আপলিফট' প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয় এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ ১০,০৪০টি বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় লাইব্রেরিটির দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে এটি শাহবাগ এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে খুলনা ও চট্টগ্রামে এবং ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীতে বিভাগীয় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হয়। এসময়ে 'বাংলাদেশ পরিষদ'-এর অধীনে জেলা ও মহকুমায় তথ্যকেন্দ্র ও লাইব্রেরি বিদ্যমান ছিল। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে সরকার উক্ত বাংলাদেশ পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনে কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলাসদর মিলিয়ে বর্তমানে

দেশে মোট ৭০টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে বিভাগীয় গ্রন্থাগার ৪টি এবং উপজেলা গ্রন্থাগার রয়েছে ২টি।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বুক সেন্টার, যা স্বাধীন বাংলাদেশে হয় 'বাংলাদেশ বুক সেন্টার'। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে একে আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করা হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' নামে। এটি মুলত বেসরকারি লাইব্রেরিগুলোতে অর্থ ও বই অনুদান এবং লাইব্রেরিয়ানদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। প্রকাশনা ও কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরস্কারও প্রদান করে।